আজকের কাগজ

তারিখ 18 NOV 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

বাংলাদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কাঠামো

এম. এম. আকাশ

"Shall there come a day when man's teacher is nature, and humanity is his book and life his school?"

(KAHLIL GIBRAN)

শিক্ষাকে দু'টো প্রধান ধারায় ভাগ করে দেখা যায় ঃ

ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যা শুরু হয় পাঠশালায়।

খ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা যার শুরু জন্মের পর থেকে পৃথিবীর পাঠশালায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বনির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী দক্ষতার সৃষ্টি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন পরিস্থিতিতে স্বাধীন ও সৃজনশীলভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি। এরই পোশাকী নাম 'অভিযোজন ক্ষমতা' (Adaptibility)। দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা আমরা যতদিন বেঁচে রয়েছি ততদিনই চালু থাকে। প্রথম ধরনের শিক্ষা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র জীবনের পূর্বেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথম ধরনের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যে তা দক্ষতা সৃষ্টি করলেও জ্ঞান বা Wisdom নাও সৃষ্টি করতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে বলে অবশেষে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দক্ষতাও সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমটি নিছক জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয়। ২য়টি উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রথমটি শেখানো যায়, ২য়টি নিজের চেষ্টাতে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করতেহয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটি দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছি ঃ আমরা কি শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতার প্রশিক্ষণে জোর দেব না কি সৃজনশীলভাবে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করবো? যান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে তুলতেই জোরটা দিবো, না কি নিত্য নতুন সৃষ্টির উপর জোর দিবো?

২। এই দ্বিধার মীমাংসা সম্ভব যদি আমরা শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে এমনভাবে বিন্যস্ত করি যেখানে দু'টি উদ্দেশ্যই যুগপৎ অর্জন করা যায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে দক্ষতা ও জ্ঞান, নিয়ম শিক্ষা ও স্বাধীনতার স্পৃহা, ফর্মূলা ও সৃজনশীলতা উভয়েরই সুযোগ শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে। বলা বাহুল্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে প্রথম যান্ত্রিক ধারাটিই মূখ্য ধারা হিসেবে বিরাজমান। কোথাও কোথাও দ্বিতীয় ধারাটি experiment হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও দ্রুতই তাকে প্রথম ধারা আত্মসাত করে নিয়েছে। (রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তি নিকেতন এর অন্যতম উদাহরণ)।

৩। তাই দ্বিতীয় ধারার শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম, পাঠদান প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠের ভূগোল সবই আমূল বদলাতে হবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি করণীয় প্রাথমিক ইঙ্গিত মাত্র দেয়া যেতে পারে। প্রথমত আমাদের নিজস্ব বাস্তব জীবনে যে সব জীবন্ত সমস্যা বিদ্যমান যেগুলো নিয়ে আমরা আলোড়িত সেগুলোকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে। সেগুলো চিহ্নিতকরণ, সেগুলোর বিশ্লেষণ, সেগুলোর বিভিন্ন সমাধানের তুলনামূলক মূল্যায়নই হবে নতুন পাঠ্যসূচির প্রধান সারবস্তু। দ্বিতয়িত পাঠদান করতে হবে মূলত অংশীদারীত্বমূলক আলোচনার মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং কখনো ছাত্র হবেন শিক্ষক, শিক্ষক হবেন ছাত্র।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকার ইতি টানছি। 'রাশিয়ার চিঠিতে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষকে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয় তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক'।

তৃতীয়ত পরীক্ষা পদ্ধতি হবে এমন যেখানে শুধু পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান নয় নতুন সমস্যা সমাধানে তার সৃজনশীলতাও পরীক্ষিত হবে।

চতুর্থত পাঠদানের স্থানীক গণ্ডি বা ভূগোল শুধু চার দেওয়ালের শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পাঠ্য বিষয়টি জীবনের যেই ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত সেই ক্ষেত্রে সরেজমিনে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেখানে গিয়েই পাঠ নিতে হবে। হতে পারে সেটা কল-কারখানা, ক্ষেতখামার বা নির্জন বনভূমি। হয়তো এ জন্য বছরের শুরুতেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরী করে এ ধরনের শিক্ষার জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করতে হবে।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলো না নিয়ে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো বজায় রেখে প্রচলিত পাঠ্যসূচিতে সামান্য দু-একটি নতুন বিষয় সংযোজন করে দিলেই সকল ল্যাঠা চুকে যাবে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি যাতে নৈতিক শিক্ষাও দেয়া যায় সে উদ্দেশ্যে সকলের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বা নীতি শিক্ষা নামক একটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটা করলেই সকল ছাত্র একদিন দায়িত্ববান, নীতিনিষ্ঠ সৃজনশীল জীবে পরিণত হবেন! সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এক সময় ভাবা হতো যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে ১ বছরের জন্য দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদ শিখিয়ে দিলেই তারা একটি আধুনিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সমাজে তাদের সৃজনশীল মানসিক ভূমিকা নিশ্চিত হবে। বলাবাহুল্য সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে সিলেবাসের মাধ্যমে যান্ত্রিকভাবে শিখানো যায় না। সমগ্র শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সৃজনশীলতাকে সযত্ন লালনের ব্যবস্থা না করলে, প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর পাশাপাশি প্রতিটি পাঠ্যসূচীতে একটি বিস্তৃত প্রয়োগনির্ভর অংশ না থাকলে এবং সর্বত্র নবীনতা, সমালোচনা ও অভ্যস্ত রীতির বিরোধিতাকে গভীর মনোযোগ ও মূল্যদানের ব্যবস্থা না থাকলে সৃজনশীলতা যান্ত্রিকভাবে কখনোই অর্জন করা যাবে না।

৫। উল্লেখিত নতুন 'আদর্শে' বা 'উদ্দেশ্যে' শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সংগ্রামে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্রদের। আমরা চাকুরীরত শিক্ষকরা অভ্যস্ত সুবিধাগুলো সহজে ছাড়বো না, যতক্ষণ না ছাত্ররা আমাদেরকে তা ছাড়তে বাধ্য করছে। তারা যদি একযোগে বলতে পারেন, এসব 'রাবিশ' আমরা পড়বো না কারণ এগুলো স্বদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন, শিক্ষকদের বাক্যকে আমরা আর বেদবাক্য মনে করবো না কারণ আমরাও জ্ঞান অন্বেষণে সক্ষম সহযাত্রী হতে চাই, তোতাপাখী হতে চাই না। আমরাও শিক্ষকদের পরীক্ষা নিতে চাই, নম্বর দিতে চাই, বলতে চাই কোন শিক্ষক ভাল পড়িয়েছেন, কোন শিক্ষক ফাঁকি দিচ্ছেন ইত্যাদি, তাহলেই একদিন হয়তো সম্ভব হবে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলানো। এই কাজ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

৬। এইভাবে বদলে যাওয়া নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্ররা কৌতূহলী সজীব মনের অধিকারী হবেন। তারা স্বদেশ ও পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতি উন্নাসিক হবেন না, আত্মকেন্দ্রিক হবেন না। প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা, নিয়ম ও দক্ষতা আয়ত্ত করেও তারা কখনোই অন্ধের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়মাধীন যন্ত্রে পরিণত হবেন না। এই নতুন নাগরিকেরা বিশ্বসংস্কৃতির রংধনুতে আরেকটি নতুন রং সংযোজন করবেন। এইভাবে পৃথিবীর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করবেন।

৭। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকার ইতি টানছি। 'রাশিয়ার চিঠিতে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষকে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয় তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক'। (রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা-২১৬)।

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত ১৯৯৩ সালের শিক্ষা বিষয়ক গোল টেবিলের আলোচনায় পঠিত হয়েছিল।]

এম. এম. আকাশ ঃ সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।